



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 77-86

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.507



আধুনিকতার ছায়ায় ঝাড়খণ্ডের ঝাঁপান ও সাখীগান-একটি নৃতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতিগত পর্যালোচনা

অমৃত মণ্ডল, গবেষক, বাংলা বিভাগ, সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড, ভারত

Received: 15.09.2026; Accepted: 22.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Jharkhand possesses rich and diverse folk traditions that embody the collective memory, ritual practices, social relationships, and cultural identities of its rural and indigenous communities. Among these traditions, Jhanpan and Sakhi Gaan occupy a distinctive place as performative expressions deeply embedded in local socio-cultural and ritual contexts. However, rapid modernisation, urbanisation, migration, technological expansion, and the growing dominance of popular and digital entertainment have significantly transformed the traditional environments in which these folk forms were created, performed, and transmitted. This paper examines the cultural significance, changing forms, and contemporary challenges of Jhanpan and Sakhi Gaan from anthropological and folkloristic perspectives. Drawing upon ethnographic observation, field-based interactions, oral narratives, and interviews with tradition bearers, performers, and elderly community members, the study explores the relationship between performance, community participation, ritual practice, oral transmission, and collective identity. It pays particular attention to how changing lifestyles, declining intergenerational transmission, migration, commercialisation, and diminishing participation in traditional cultural practices have gradually marginalised these forms. At the same time, the study considers adaptation and cultural negotiation as important processes through which folk traditions respond to changing social conditions. It argues that Jhanpan and Sakhi Gaan should be understood not merely as forms of rural entertainment but as repositories of indigenous knowledge, social memory, cultural values, and community identity. The paper therefore emphasises systematic documentation, audiovisual archiving, community-based preservation, intergenerational transmission, and institutional support as essential measures to safeguard and revitalise these vulnerable elements of Jharkhand's intangible cultural heritage.

Keywords: Jharkhand, Jhanpan, Sakhi Gaan, folk music, folk culture, modernisation, cultural transformation, oral tradition, ethnography, intangible cultural heritage

"একশত শিষ্য সদা শংখের যোগান।

বাক্সিয়া ছত্রিশবানা নাগের ঝাঁপান।।

তথির উপরে চড়ে নাগ আভরণ।

বিষম শব্দ আর ঢাকের বাজন।।"^১

সভ্যতার ইতিহাস কেবল রাজার উত্থান-পতনের ইতিহাস নয়, বরং সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, বিশ্বাস, অনুভূতি, স্মৃতি এবং সাংস্কৃতিক চর্চার ধারাবাহিকতাও সেই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের হাসি-কান্না, উৎসব-পার্বণ, শ্রম, প্রেম, ভয় এবং আশার যে বহুমাত্রিক প্রকাশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকসমাজে প্রবাহিত হয়েছে, তারই অন্যতম রূপ হলো লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতি কোনো লিখিত শাস্ত্রের অনুশাসনে আবদ্ধ নয়, এটি মানুষের জীবনচর্চার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। লোকগান, লোককথা, লোকনাট্য, আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় লোকবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে একটি সমাজ তার সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণ করে।^২

সর্পপূজার প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন। তবে এটিকে সাধারণ পশুপূজার পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ, সাপকে কেবল প্রাণী হিসেবে নয়, বরং সর্পদেবতা বা সর্পাত্মার রূপে পূজা করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সর্পপূজার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সর্প-টোটোমের ধারণা থাকলেও সেখানে সর্পপূজার প্রথা নেই। আফ্রিকার বহু অঞ্চলে সর্পদেবতার অস্তিত্ব বিশ্বাস করা হয়। ভারতবর্ষে গৃহসংলগ্ন বাস্তুসাপকে মঙ্গলসূচক মনে করে পূজা করা হয়। বিশেষত বিষধর সাপ, যেমন গোখরা, যদি হত্যা করা হয়, তবে তাকে অগ্নিদাহের মাধ্যমে সংস্কার করার প্রথাও প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীনকালে ভারতের অস্ট্রিকভাষী আদিম মানবসমাজ সর্পপূজার প্রচলন করেছিল এবং সাপকে তারা টোটোম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। অরণ্য ও পাহাড়নির্ভর জীবনে যারা খাদ্যের সন্ধানে সংগ্রাম করত, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপেই বিপদের আশঙ্কা ছিল। সাপ যদি আকস্মিক ছোবলে মানুষের রক্তে এক ফোঁটা বিষ প্রবেশ করাতে পারে, তবে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অদৃশ্য সর্পদেবতার স্মরণ করা ছাড়া মানুষের আর কোনো উপায় থাকে না। এই পরিস্থিতিতেই কাজে লাগিয়ে আদিম পুরোহিততন্ত্র ‘মন্ত্র’ নামক অর্থহীন শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ খুঁজেছিল।

ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে ঝাড়খণ্ড একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সীমান্ত বাংলায় জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে ‘রোহিণী পরব’ পালিত হয়, যা স্থানীয় লোকবিশ্বাসে সৃষ্টির পরব হিসেবে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই তিথিতে মনসা পূজারও বিধান প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে রোহিণী তিথিকে সর্পবিদ্যা শিক্ষার সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়, এদিন শিক্ষার্থীরা গুরুকুল বা গুরুর গৃহে প্রথম পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করে। রোহিণী পরবের দিনে প্রভাতের সূচনা হওয়ার আগেই গোবর মিশ্রিত জল ছিটিয়ে গৃহের চারপাশে একটি প্রতীকী সুরক্ষাবেষ্টনী নির্মাণ করা হয়। লোকবিশ্বাস অনুসারে, এই আচার পালনের ফলে সারা বছর সাপ গৃহে প্রবেশ করতে পারে না। আঞ্চলিক ভাষায় এই প্রথা ‘ধরণী-বন্ধন’ বা ‘ধরণী-বাঁধা’ নামে পরিচিত, যা গ্রামীণ সমাজে সাপ-সংক্রান্ত ভয়, লোকজ জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, সংগীত ও প্রতিরোধমূলক বিশ্বাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত।^৩ অরণ্যবেষ্টিত ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে সাপের উপদ্রব বেশি হওয়ায় এখানে দেবী মনসার প্রভাব ও গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। ‘মনসা’ শব্দের উৎপত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা মতভেদ ও বিতর্ক বিদ্যমান। কেউ কেউ মনে করেন, মনসা মূলত দ্রাবিড় সমাজে পূজিত ‘মাম্মা’ দেবীর রূপ, এবং সেই ‘মাম্মা’ শব্দ থেকেই ‘মনসা মা’ নামটির উদ্ভব হয়েছে।

এই মতের সমর্থকেরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ঝাড়খণ্ডে মনসা পূজার প্রচলন দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সংস্কৃতি থেকেই এসেছে। তবে ডক্টর সুকুমার সেন এই ধারণাকে কল্পনাপ্রসূত বলে যুক্তিসহ খণ্ডন করেন। তাঁর মতে, ‘মনসা’ শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকে গৃহীত নয়; বরং এটি আর্যভাষাজাত শব্দ। পাণিনির ব্যাকরণ সূত্রের আলোচনায়ও ‘মনসা’ নামটির প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঋগ্বেদে ‘মনস্’ নামে একটি পুংলিঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং চন্দ্রগামিন তাঁর ব্যাকরণগ্রন্থে ‘মনসা’ শব্দটিকে উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ, ‘মনসা’ শব্দটির মূল সম্পর্ক ‘মনস্’ শব্দের সঙ্গেই যুক্ত। সাধারণভাবে বাগদী, বাউরি, মাল, ভূমিজ, মাহাতো ও ঘুনিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই মনসা পূজার প্রচলন সর্বাধিক দেখা যায়। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মনসা দেবীর পূজায় এরা কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে পূজারী হিসেবে গ্রহণ করে না। পরবর্তী কালে পুরোহিততান্ত্রিক প্রথায় এই মনসা দেবীকেই কেন্দ্র করে সর্পসংক্রান্ত মন্ত্র রচনার প্রয়াস দেখা যায়। মনসার নাম উচ্চারণ করে নানা সর্পমন্ত্র প্রণীত হয়। এমনকি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থেও মনসা দেবীর প্রশস্তি রচিত হয়েছে—

অমলে বিমলে নির্মলে মনসে

মহামনসে অচ্যুতে অদ্ভুতে—

মুণ্ডে জীবতে রক্ষ স্বস্তিম

সর্ব উপদ্রবেভ্য স্বাহা।^৪

সাহিত্য পর্যালোচনা:

ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা পরিচালিত হলেও ঝাঁপান এবং বিশেষত সাখিগানকে কেন্দ্র করে সমন্বিত ও বিশদ গবেষণা এখনও তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল। অধিকাংশ গবেষণায় মনসা পূজা, মনসামঙ্গল কাব্য, লোকবিশ্বাস, সর্পসংস্কৃতি কিংবা আঞ্চলিক লোকউৎসবের আলোচনা স্থান পেলেও ঝাঁপান উৎসবের অন্তর্নিহিত সংগীতধারা, তার নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য এবং আধুনিকতার অভিঘাতে সৃষ্ট সংকটকে স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হিসেবে খুব কমই বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে এই ক্ষেত্রটি এখনও গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ শূন্যস্থান বহন করে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থে লোকউৎসব, লোকবিশ্বাস এবং গ্রামীণ ধর্মাচরণের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলার লোকজ ধর্মীয় আচার কেবল ধর্মীয় অনুশীলন নয়, বরং সামাজিক সংহতি, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং লোকসমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি।^৫ দুলাল চৌধুরী এবং পল্লব সেন গুপ্ত সম্পাদিত বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ-এ মনসা পূজা, ঝাঁপান, সর্পসংস্কৃতি এবং লোকউৎসব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থটি থেকে জানা যায় যে ঝাঁপান মূলত মনসা উপাসনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত একটি প্রাচীন লোকোৎসব, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকচিকিৎসা, ওঝা-গুণিনের কার্যকলাপ এবং গ্রামীণ মানুষের সমবেত অংশগ্রহণ এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। তবে সাখিগানের সাহিত্যিক রূপ, সংগীতধারা ও বর্তমান সংকট নিয়ে সেখানে বিশদ আলোচনা অনুপস্থিত।^৬ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক বিকাশ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর আলোচনায় বেহুলা-লখিন্দর, চাঁদ সদাগর এবং দেবী মনসার কাহিনি মধ্যযুগীয় সমাজচেতনার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণ সাখিগানের আখ্যানভিত্তিক গঠন ও সাংস্কৃতিক উৎস অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক হলেও লোকপরিবেশনার জীবন্ত রূপ নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি।^৭ পূর্ববর্তী গবেষণাগুলি লোকসংস্কৃতির তাত্ত্বিক ভিত্তি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ঝাঁপান ও সাখিগানের উপর গবেষণা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। ফলে এই গবেষণাটি শূন্যস্থান পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

গবেষণা সমস্যা:

ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি বহুযুগের সামাজিক অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রকৃতিনির্ভর জীবনদর্শন এবং সামষ্টিক চেতনার এক মূল্যবান ভাণ্ডার। এই ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ঝাঁপান এবং তার অবিচ্ছেদ্য সংগীতধারা সাখিগান। একসময় মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝাঁপান উৎসব ছিল গ্রামীণ জীবনের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক আয়োজন। এই উৎসবকে ঘিরে পরিবেশিত সাখিগান শুধু ধর্মীয় আখ্যানের বাহক ছিল না; বরং লোকসমাজের ইতিহাস, সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিক শিক্ষা, মানবিক অনুভূতি এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের এক জীবন্ত দলিল হিসেবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে।^৮ কিন্তু বর্তমান সময়ে আধুনিকতা, নগরায়ণ, বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রসার এবং জীবনযাত্রার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ঝাঁপান ও সাখিগান ক্রমশ অস্তিত্বের সংকটে পতিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই লোকঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে; অন্যদিকে প্রবীণ শিল্পীদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। অধিকাংশ সাখিগান এখনও মৌখিকভাবে প্রচলিত হওয়ায় শিল্পীদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য গানও চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তদুপরি, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, সাংস্কৃতিক মঞ্চের সংকোচন এবং পর্যাপ্ত সরকারি উদ্যোগের অভাবে এই ঐতিহ্য আজ আরও বিপন্ন। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যা হলো—ঝাড়খণ্ডের ঝাঁপান ও সাখিগানের বর্তমান বাস্তব অবস্থান কী, আধুনিকতার প্রভাবে এই ঐতিহ্য কীভাবে পরিবর্তিত ও সংকুচিত হচ্ছে, এর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য কতখানি, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই বিলুপ্তপ্রায় লোকঐতিহ্য সংরক্ষণে কী ধরনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানই বর্তমান গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ও প্রাসঙ্গিকতা।^৯

ঝাঁপান ও সাখিগানের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনরীতি:

প্রান্তিক বাংলা এবং সমগ্র ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে শ্রাবন সংক্রান্তির মনসা পূজার সময় এবং আশ্বিন সংক্রান্তি ‘ডাক সংক্রান্তি’ সময় ঝাড়খণ্ডে ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয়। ঝাঁপান’ বলতে মনসার প্রধান উপাসক ওঝা-গুণীনদের ঘটবারি আনতে যাওয়ার জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রাকে বোঝায়। ঝাঁপানে চড়ে ওঝা-গুণীনরা যখন বারি তুলতে যান, তখন রঙবেরঙের বিষধর সাপের খেলা দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পণ্ডিতদের মতে, ‘ঝাঁপান’ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত ‘যাপ্যমান’ শব্দ থেকে, যার অর্থ মনুষ্যবাহিত যান। গুণী ঝাঁপানের ওপর বসেন এবং তাঁর শিষ্য বা চেলারা তাঁকে পুকুরঘাট বা নিকটবর্তী নদীর দিকে বহন করে নিয়ে যায়। স্নানপর্ব শেষ হলে এক ডুব দিয়ে তোলা ঘটপূর্ণ বারি নিয়ে গুণী পুনরায় ঝাঁপানে চড়ে পূজামণ্ডপে ফিরে আসেন। ঝাড়খণ্ডের বহু স্থানে এখনও ঝাঁপানের এই প্রাচীন রূপ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তবে বর্তমানে অনেক জায়গায় গরুর গাড়ির ওপর বাঁশের মাচা তৈরি করে ঝাঁপান সাজানো হয়। কোথাও আবার কয়েকটি খাটিয়া একত্রে সাজিয়ে ঝাঁপান নির্মাণ করা হয়, যার সর্বোচ্চ খাটিয়ায় গুণী আসন গ্রহণ করেন। বাঁশের মাচা বা মইযুক্ত ঝাঁপানে অশ্বারোহীর ভঙ্গিতে দুপাশে পা বুলিয়ে গুণী সাপের খেলা প্রদর্শন করতে করতে পুকুরঘাটে বারি তুলতে যান। নানাবর্ণের সর্পে অলংকৃত এই গুণীকে তখন মহাদেবের ন্যায় মনে হয়। ঝাঁপানের শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার আগে একজন ব্যক্তি মাথায় খালি ঘট নিয়ে পুকুরের দিকে এগিয়ে যান। যাওয়া-আসার পুরো সময় জুড়ে শিষ্যমণ্ডলী বা সমবেত জনতা মনসাদেবীর জাঁতগান পরিবেশন করে। যেমন—

মাকে আনতে যাবরে ক্ষীরাই নদীর কূল,
হাতে দিব লাল গামছা পায়ে জবা ফুল।^{১০}

সাখী গান আসলে মন্ত্র। এই গানের ফাঁকে ফাঁকে ঝাঁপানে আসীন গুণী মন্ত্রগান উচ্চারণ করেন। উল্লেখ্য, ঝাঁপানের সময় ব্যবহৃত এই বিশেষ মন্ত্রগানই ‘সাখিগান’ নামে পরিচিত।^{১১} মনসামঙ্গল কাহিনি, বেহুলা-লখিন্দরের অমর প্রেম, চাঁদ সদাগরের অহংকার, দেবী মনসার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং লোকজীবনের নানা মানবিক অনুভূতি সাখিগানের সুরে নতুন জীবন লাভ করে। এই গান কেবল পৌরাণিক কাহিনি পরিবেশন করে না, বরং সমাজের নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সমষ্টিগত চেতনাকেও বহন করে। সাখিগানের প্রতিটি পংক্তি যেন গ্রামীণ মানুষের হৃদয়ের ভাষা, প্রতিটি সুর যেন ইতিহাসের অন্তঃসলিলা থেকে উঠে আসা এক জীবন্ত স্মৃতি।^{১২}

ঝাঁপানের প্রস্তুতি পর্বে গুরু ও শিষ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূজা প্রাঙ্গণ থেকে যখন ঝাঁপান শুরু হয়, তখন গুণী তাঁর বাঁধনমন্ত্র উচ্চারণ করে নিজের শরীরকে সুরক্ষিত করেন। কারণ, সমবেত জনতার মধ্যে থেকে কোনো প্রতিপক্ষ গুণী বা ওঝা গুণ প্রয়োগ করে তাঁর ঝাঁপানে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ঝাঁপানারূঢ় গুণী বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করেন। যেমন-

হাটে গুরু বন্দি বাটে গুরু বন্দি

আর বন্দি হাটন হাটি

শিক্ষাগুরু বন্দি দীক্ষাগুরু বন্দি

আর বন্দি কাঁউরা কামাটি।

গাউনের গাউন বন্দি নাটুয়ার বন্দি তাল

শিরে বন্দি যুগী দরশন হাতে শিবতাল।

পঞ্চদেবে ব্রহ্মা বন্দি অষ্টদেবে ডান

ছোট বড় গুণীসব উল্টে পড়ে যান।

সাপ খেলে সাপিনা খেলে

খেলে সাপিনার চিন্তে

সাপিনার বিষ নাই সাপিনার দুই দন্তে।

থাকরে সাপা নিশ্চলে

তোর মুখ বেঁধে দিনু লোহার শিকলে।

উপরে যায় খড়কুটা তলে যায় বান

বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান।

ঝাঁপান এগিয়ে চলে। সেই ঝাঁপান (শোভাযাত্রার) সঙ্গে চলবে গান— সবই মনসা-সংগীত। কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন সম্পর্কিত গানও শোনা যাবে। হঠাৎ একসময় শোভাযাত্রা থেমে যায়। কারণ, উপস্থিত কেউ একটি প্রশ্ন করেছে; আর সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যাওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। এখানে যে-কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে, এবং যে-কোনো ব্যক্তিই তার উত্তর দিতে পারে।

প্রশ্নটি হলো—

কোথা হইতে আসিয়াছ কোথা চলে যাও,

কাহার দুয়ারে তুমি ভিক্ষা মাগে খাও?

কাহার দুয়ারে তুমি বাড়ী কর আশা,

কোন্ কুলে জন্ম তোমার কোন্ গ্রামে বাসা?^{১৩}

ঝাঁপানের উপর থেকে গুণী উত্তর দেন-

উত্তর হইতে আসিয়াছি দক্ষিণে চলে যাই,

শিবের দুয়ারে আমি ভিক্ষা মাগে খাই।

ধর্মের দুয়ারে আমি বাড়ী করি আশা,

শুদ্ধ কুলে জন্ম আমার নিজ গ্রামে বাসা।

মা মনসার গান গাইতে গাইতে ঝাঁপানের শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষের তর্ক-বিতর্কে ঝাঁপানের পরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণচঞ্চল ও উত্তেজনাময়। কৌতূহলী দৃষ্টিতে সমবেত জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে—কোন দিক থেকে হঠাৎ কে গুণীর উদ্দেশ্যে প্রহ্লাদাণ নিষ্ক্ষেপ করবে। প্রতিপক্ষ গুণী যখন উচ্চকণ্ঠে সাখি ধরেন, তখন উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।^{১৪}

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব:

ঝাঁপান উৎসব কেবল একটি ধর্মীয় আচার বা পূজা নয়, এটি গ্রামীণ সমাজে সামাজিক মেল বন্ধনকে সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপায়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষ আনন্দের সঙ্গে একত্রিত হয়ে উৎসব পালনে অংশগ্রহণ করে, যার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক সম্প্রীতি মজবুত হয়। ঝাঁপান উৎসবের মাধ্যমে লোকসংগীত, প্রাচীন লোকবিশ্বাস ও লোকনৃত্যের প্রচার ঘটে। একই সঙ্গে এই উৎসব আদিবাসী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। পাশাপাশি, এই উৎসব স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। মেলা উপলক্ষে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্থানীয় কারিগররা তাদের বিভিন্ন পণ্য বিক্রির সুযোগ পান, যা তাদের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে ওঠে।^{১৫}

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ঝাঁপান ও সাখিগানকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলি কেবল সংগীত বা বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং একটি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়, বিশ্বাস এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন। ঝাঁপান উৎসব বিশেষভাবে সাঁওতাল, মুন্ডা ও ওরাঁও প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। আদিবাসী সমাজে সাপকে শক্তি ও সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে মানা হয়। সাখিগান ঝাঁপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গীত, যা মূলত সংলাপধর্মী ও আখ্যানভিত্তিক। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি মৌখিক ঐতিহ্য (Oral Tradition), যার মাধ্যমে সমাজের মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। এই গানে ব্যবহৃত ভাষা সাধারণত লোকভাষাভিত্তিক এবং সহজবোধ্য, যা গ্রামীণ সমাজের মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও অনুভূতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।^{১৬}

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ঝাঁপান:

আধুনিক সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রাকে যেমন নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে, তেমনি বহু প্রাচীন লোকঐতিহ্যকে অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ঝাঁপান ও সাখিগানও সেই সংকটের অন্যতম শিকার। একসময় শ্রাবণ সংক্রান্তি কিংবা মনসা পূজার দিন গ্রামবাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত ঢাকের তালে, শঙ্খধ্বনিতে এবং সাখিগানের সুরে। আজ সেই প্রাণময় পরিবেশ ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। যে কণ্ঠ একদিন লোকসমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বাহক ছিল, আজ তা আধুনিকতার কোলাহলে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।^{১৭} তাছাড়া বর্তমান সময়ে ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন (১৯৭২) সাল অনুযায়ী বন্য প্রাণী, পাখি, উদ্ভিদ ও প্রাণীকল্যাণ বিষয়ক সচেতনতার কারণে জীবন্ত সাপ ব্যবহারের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবুও ঝাঁপান উৎসব তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অটুট রেখে বিভিন্ন স্থানে

প্রতীকীভাবে পালিত হয়ে থাকে। এখন অনেক জায়গায় সরাসরি সাপ প্রদর্শনের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ও লোকগানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক রূপ কে উপস্থাপন করা হয়।^{১৮}

গবেষণার ক্ষেত্র:

বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে ঝাড়খণ্ডের বোকারো, ধানবাদ, রাঁচি এবং পূর্ব সিংভূম জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং লোকঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার বিচারে এই অঞ্চলগুলি ঝাঁপান উৎসব ও সাখিগানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত। দীর্ঘকাল ধরে এখানকার গ্রামীণ সমাজে মনসা পূজা, সর্প-উপাসনা, লোকবিশ্বাস, মন্ত্রসাধনা এবং মৌখিক লোকঐতিহ্যের সঙ্গে ঝাঁপান ও সাখিগানের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে এই অঞ্চলগুলি কেবল একটি ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্র নয়, বরং লোকজ স্মৃতি, সামষ্টিক পরিচয় এবং ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চেতনার এক জীবন্ত ভাণ্ডার হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নগরায়ন, শিল্পায়ন, আধুনিক যোগাযোগপ্রযুক্তির বিস্তার, গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, অভিবাসন এবং পরিবর্তিত জীবনযাত্রার ফলে এই লোকঐতিহ্য দ্রুত বিলুপ্তির সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ক্ষেত্রসমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে বোকারো জেলার চন্দনকিয়ারি, নাওয়াদিহ ও বেরমো, ধানবাদ জেলার নিরসা, গোবিন্দপুর ও বাঘমারা, রাঁচি জেলার সিল্লি, সোনাহাতু ও তামাড়; এবং পূর্ব সিংভূম জেলার ঘাটশিলা, ধলভূমগড় ও চাকুলিয়া অঞ্চলে। গবেষণায় গুণগত (Qualitative) গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant Observation), আধা-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Semi-structured Interview), মৌখিক ইতিহাস (Oral History), স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা (Informal Discussion) এবং লোকসংগীতের অডিও-ভিজুয়াল নথিভুক্তকরণ (Audio-visual Documentation) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বয়স, লিঙ্গ, পেশা ও সামাজিক পটভূমির তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঝাঁপান উৎসব ও সাখিগানের বর্তমান অবস্থা, সামাজিক তাৎপর্য, সাংস্কৃতিক রূপান্তর এবং সংরক্ষণ-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বোকারো জেলার চন্দনকিয়ারি গ্রামের প্রবীণ লোকশিল্পী কাশিনাথ মাহাতো (৭০) অভিমত, “একসময় যে আসরে শত শত মানুষ সমবেত হতেন, আজ সেখানে হাতে গোনা কয়েকজন দর্শকও উপস্থিত হন না।” তাঁর মতে, বর্তমান সময়ে টেলিভিশন, স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং আধুনিক বিনোদনমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের ফলে নতুন প্রজন্মের সাংস্কৃতিক আগ্রহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। ধানবাদ জেলার নিরসা গ্রামের ৭৫ বছর বয়সী গুণী ওঝা বাবুলাল সহিস এবং রাঁচি জেলার তামাড় গ্রামের ৭২ বছর বয়সী গুণী ওঝা বুলন গোস্বামী-এর অভিমত অনুযায়ী, ঝাঁপান উৎসব ও সাখিগান কেবলমাত্র লোকবিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি মনসা দেবীর আরাধনা, সর্প-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস এবং গ্রামীণ ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাঁদের অভিমত অনুযায়ী, আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার প্রসার, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশ এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আচার ও লোকবিশ্বাসের প্রতি মানুষের নির্ভরতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পূর্ব সিংভূম জেলার ধলভূমগড় গ্রামের মহিলা লোকশিল্পী মালতী দেবী (৬৫) বক্তব্যে প্রতীয়মান হয়েছে যে, উৎসব উপলক্ষে নারীরা সমবেতভাবে সাখিগান পরিবেশনের মাধ্যমে ধর্মীয় আখ্যানের পাশাপাশি পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং লোকজ জীবনদর্শনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কিন্তু বর্তমানে কর্মসংস্থানের পরিবর্তন, অভিবাসনের প্রবণতা, যৌথ পরিবারের ভাঙন, পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামো এবং নতুন প্রজন্মের অনাগ্রহের কারণে এই ঐতিহ্যবাহী গীতধারার চর্চা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।^{১৯}

সংরক্ষণ ও পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা:

ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে ঝাঁপান ও সাখি গান এক বিশেষ স্থান অধিকার করে, এই দুই ধারার সংগীত শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং গ্রামীণ জীবনের বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার, সামাজিক সম্পর্ক এবং সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন সচেতন উদ্যোগের এক জীবন্ত প্রকাশ।^{২০} বিশেষত মনসা পূজার সঙ্গে যুক্ত ঝাঁপান উৎসব এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশিত সাখি গান, স্থানীয় মানুষের আধ্যাত্মিকতা, এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।^{২১} কিন্তু আধুনিকতার দ্রুত অগ্রগতির ফলে এই ঐতিহ্য আজ বিলুপ্তির পথে। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদন, যেমন মোবাইল ফোন, টেলিভিশন এবং সামাজিক মাধ্যম, গ্রামীণ জীবনের সাংস্কৃতিক চর্চায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। নতুন প্রজন্ম ঐতিহ্যবাহী ঝাঁপান ও সাখি গানের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে, ফলে এই মৌখিক ঐতিহ্য ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। একসময় যেসব গ্রামে উৎসবের সময় এই গানগুলি মুখরিত হত, আজ সেখানে নীরবতা নেমে এসেছে।^{২২} শিল্পীদের আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক স্বীকৃতির অভাব এবং উপযুক্ত মঞ্চের অভাবও এই সংকটকে তীব্র করেছে। তবুও এই সংকটের মধ্যেই পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট।

প্রথমত, ঝাঁপান ও সাখি গানকে সংরক্ষণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে নথিভুক্তকরণ (documentation) প্রয়োজন। অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং, লিখিত সংকলন এবং ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির মাধ্যমে এই গানগুলিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির উদ্যোগে ক্ষেত্রসমীক্ষা পরিচালনা করে শিল্পীদের জীবন, গান এবং পরিবেশনার প্রেক্ষাপট লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে লোকসংগীতকে যুক্ত করা যেতে পারে। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ঝাঁপান ও সাখি গানের অন্তর্ভুক্তি নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই ঐতিহ্যের প্রতি সচেতনতা ও আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে। সাংস্কৃতিক কর্মশালা, সেমিনার এবং লোকসংগীত উৎসবের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি এই ধারার সঙ্গে পরিচয় করানো যেতে পারে।

তৃতীয়ত, শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। লোকশিল্পীদের জন্য ভাতা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে তারা এই পেশায় টিকে থাকার প্রেরণা পাবেন। স্থানীয় মেলা, পর্যটন কেন্দ্র এবং সাংস্কৃতিক মঞ্চের ঝাঁপান ও সাখি গানের পরিবেশনার সুযোগ বাড়ালে এই শিল্পের পুনর্জাগরণ সম্ভব।

চতুর্থত, আধুনিক প্রযুক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ইউটিউব, ফেসবুক এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই গানগুলির প্রচার ও প্রসার ঘটালে বৃহত্তর আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে নতুন সৃজনশীলতার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী গানের সঙ্গে আধুনিক উপস্থাপনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।^{২৩}

আলোচনা ও ফলাফল:

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে ঝাঁপান ও সাখিগান একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকসংগীতধারা ছিল। গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা বা সামাজিক উৎসবের সময় এই গান পরিবেশিত হতো এবং মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত। ঝাঁপান পরিবেশনার মাধ্যমে পৌরাণিক কাহিনি, লোককথা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা সংগীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হতো। সাখিগান এই পরিবেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।^{২৪} কিন্তু মাঠসমীক্ষা থেকে জানা যায় যে বর্তমানে এই লোকসংগীতধারার চর্চা

অনেকটাই কমে গেছে। প্রবীণ শিল্পীরা এখনও এই ঐতিহ্য স্মৃতির মধ্যে ধরে রেখেছেন, কিন্তু নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই সংগীতের প্রতি আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম। আধুনিক গণমাধ্যমের প্রসার, শহরমুখী জীবনযাত্রা এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণে লোকসংগীতের ধারা কমে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে লোকশিল্পীরা জীবিকার অভাবে অন্য পেশায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে ঝাঁপান ও সাখিগান ধীরে ধীরে সামাজিক জীবনের প্রান্তে সরে যাচ্ছে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে যে গ্রামীণ সমাজের সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে ঝাঁপান ও সাখিগান এখনও জীবিত রয়েছে। প্রবীণ শিল্পীদের স্মৃতি, লোককথা এবং কিছু স্থানীয় উৎসবে এখনও এই গানের সীমিত চর্চা আজও লক্ষ্য করা যায়।^{২৫} গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে যথাযথ সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হলে ঝাঁপান ও সাখিগানের মতো লোক সাংস্কৃতিক ধারাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। সাংস্কৃতিক উৎসব, গবেষণা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এই ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

উপসংহার:

ঝাড়খণ্ডের ঝাঁপান ও সাখিগান কেবল একটি সংগীতধারা নয়, বরং এগুলি একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ বাহক, যা দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ সমাজে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। কিন্তু আধুনিকতার প্রভাব, নগরায়ন, গণমাধ্যমের বিস্তার এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে ঝাঁপান ও সাখিগানের চর্চা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, ফলে এই ঐতিহ্য বর্তমান সময়ে লুপ্তপ্রায় অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই ঝাঁপান ও সাখিগানের মতো লোকঐতিহ্য সংরক্ষণ করা কেবল একটি শিল্পরূপ রক্ষা করা নয়, বরং একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সামাজিক স্মৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।^{২৬}

তথ্যসূত্র:

১. করন, সুধীর কুমার। সীমান্ত বাঙলার লোকযান। বামচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী ১৮এ টেমার লেন, ১৩৭১, কলকাতা, পৃ. ৬০।
২. বক্সি ঘোষ, মিতা। লোক সাহিত্য ২০১৪। পুরুলিয়া, পৃ. ৩-৪।
৩. করন, সুধীর কুমার। সীমান্ত বাঙলার লোকযান। বামচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী ১৮এ টেমার লেন, ১৩৭১ কলকাতা, পৃ. ৬৩।
৪. তদেব, পৃ. ৬২।
৫. ভট্টাচার্য, অশুতোষ। বাংলার লোকসংস্কৃতি। দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ১২৫-২২৮।
৬. চৌধুরী, দুলাল এবং সেনগুপ্ত, পল্লব। লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়া টোলা লেন। ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ২০৮।
৭. সেন, সুকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮ কলকাতা, পৃ. ২২৫।
৮. মাহাতো, হংসেশ্বর, রায়, সুভাষ, মাহাতো, ক্ষীরোদ চন্দ্র, মাহাতো, কিরীটি। শিব শঙ্কর সিং মানভূমের লুপ্তপ্রায় লোকগীত। মানভূম কালচারাল আকাদেমিক তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০২৫, পৃ. ৫।

৯. UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 2003. Articles 7-9.
১০. মাহাতো, হংসেশ্বর, রায়, সুভাষ, মাহাতো, ক্ষীরোদ চন্দ্র, মাহাতো, কিরীটি। শিব শঙ্কর সিং মানভূমের লুপ্তপ্রায় লোকগীত। মানভূম কালচারাল আকাদেমিক তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০২৫, পৃ. ৫।
১১. মাহাতো, চন্দ্র বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথ বেরা বানী শিল্প ১৪ এ টেমার লেন, ১৯৭৮, কলকাতা, পৃ. ১৪৪।
১২. রায়, ড. তপন ও সাহা, ড. রীতা। লোক সংগীতের সহজ পাঠ। লালমাটি প্রকাশন ও শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৭৯।
১৩. মাহাতো, হংসেশ্বর, রায়, সুভাষ, মাহাতো, ক্ষীরোদ চন্দ্র, মাহাতো, কিরীটি। শিব শঙ্কর সিং মানভূমের লুপ্তপ্রায় লোকগীত। মানভূম কালচারাল আকাদেমিক তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০২৫, পৃ. ৪৮।
১৪. তদেব, পৃ. ৪৯।
১৫. করন, সুধীর কুমার। সীমান্ত বাঙলার লোকযান, বামচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী ১৮এ টেমার লেন, ১৩৭১, কলকাতা, পৃ. ১৭৮-১৮১
১৬. তদেব, পৃ. ৬২-৬৩।
১৭. তদেব, পৃ. ৭০।
১৮. <https://en.Wikipedia.org>.
১৯. সাক্ষাৎকার: কাশিনাথ মাহাতো, গ্রামে- চন্দনকিয়ারি, জেলা- বোকরো, বাবুলাল সহিস গ্রাম- নিরসা, জেলা- ধানবাদ, ঝুলন গোস্বামী গ্রাম- তামাড়া জেলা- রাঁচি, মালতী দেবী গ্রাম- ধলভূমগড়া, জেলা- পূর্ব সিংভূম
২০. ভট্টাচার্য, অশুতোষ। বাংলার লোকসংস্কৃতি, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ২৮৯-৩০১।
২১. চৌধুরী, দুলাল এবং সেনগুপ্ত, পল্লব। লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ। পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৪১২- ৪১৮।
২২. করন, সুধীর কুমার। সীমান্ত বাঙলার লোকযান। বামচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী ১৮এ টেমার লেন, ১৩৭১ কলকাতা, পৃ. ১৫৪-১৬০।
২৩. UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. Articles 2, 2003, 13-15.
২৪. রায়, ড. তপন ও সাহা, ড. রীতা। লোক সংগীতের সহজ পাঠ। লালমাটি প্রকাশন ও শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৭৮।
২৫. <https://Publications.waset.org>